গতিই জীবন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্ষিপ্ত জীবনকথা

দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'-এ বিভূতিভূষণ এক জায়গায় লিখেছেন, দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ; দৈন্য বড় সম্পদ; শোক, দারিদ্র্য ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ ! যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা, যে জীবন অশ্রুকে জানেনা অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদে ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।'

কথা গুলি বিভূতিভূষণের নিজের ঝাপন থেকে অর্জন করা গভীর সত্য। আমাদের মধ্যে সামগ্রিক ভাবে ' সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদে ভরা ভয়ানক' জীবনের প্রতি প্রত্যাখ্যান যদি প্রকৃতই আমরা ঝাপন করতে রাজী থাকতাম, তাঁর উত্তরসূরী আমরা পৃথিবীকে আজকের এই বহুমাত্রিক সংকটের সমষ্টিতে পরিণত করে ফেলতাম না। সত্যদ্রষ্টা এই ঋষি মানুষটি তাঁর জীবন যাপনের মধ্যে থেকেই লাভ করেছিলেন তাঁর মরুবিজয়ের মন্ত্রটিকে। তাঁর জীবনী জানলে বোঝা যায় এরকম অর্জিত দার্শনিক উপলব্ধিই জীবন থেকে নিয়ে আমাদের অকৃপণ ভাবে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন বিভূতিভূষণ।

<u>প্রাক জন্মকালীন পারিবারিক স্থিতি,মহানন্দ সম্পর্কে ক'টি কথা</u>

বিভূতিভূষণের ঠাকুর্দা কবিরাজ তারিণীচরণ, বসিরহাট সংলগ্ন পানিতর থেকে বনগ্রাম বা বনগাঁর কাছে বারাকপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেননীল বিদ্রোহের কিছুকাল আগে । তখন নীলকর দের বেশ রমরমা। নিজে নির্ভরযোগ্য কবিরাজ ছিলেন, কাছেই মোল্লাহাটির বড়ো নীলকুঠি ছিলো। আশে পাশে সে কারণে অনেক শ্রমজীবি মানুষ এবং বেশ কিছু উচ্চবর্গের পরিবার বাস করতেন। ফলে তারিণী সেখানে কিছুকালের মধ্যেই সম্পন্ন চিকিৎসক পরিবার হয়ে ওঠেন। বারাকপুর, গোপালনগরের লাগোয়া, চালকি গ্রাম সংলগ্ন বলে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামটিকে চালকি বারাকপুর বলেও উল্লেখ করা হয়, যদিও চালকি এবং বারাকপুর দুটি আলাদা গ্রাম।

বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোরে দশম শ্রেনী পর্যন্ত বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার ফলে খানিক ইংরেজি ভাষা জানতেন এবং বেনারস থেকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে শাস্ত্রী উপাধির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু কথকতা করে ঘুরে বেড়ানোতেই তাঁর টান ছিলো বেশি। অবশ্য নীলবিদ্রেহের পরে আঞ্চলিক সমৃদ্ধি দ্রুত কমে গিয়েছিল। কিছু পরে রাসায়নিক নীল ও বাজারে এসে পড়ে। এই সঙ্গে নতুন ইংরেজী চিকিৎসায় মানুষ বেশি আকৃষ্ট হতে থাকায়, কবিরাজীর পসার ও কমে যায়। কিন্তু তা সত্বেও মহানন্দ কোনো স্থায়ী চাকরী করেন নি বেশি দিন। অনেকাংশে পরিব্রাজকের মতো ছিলো তাঁর জীবন। অনেকদিন ঘর সংসারে থাকা তাঁর ধাতে সইত না। কেবলই ঘুরে ঘুরে প্রধানত কথকতা করেই সংসার চালাতেন তিনি। নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর নির্বন্ধে, বংশরক্ষার দায়ে , ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয়

বিবাহ করেন। মহানন্দের প্রথমা স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, নিজেরই খুঁজে আনা পাত্রী মৃণালিনীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়ে, আবার পুত্রের মুখ দেখতে আসবেন একথা ব'লে বাপের বাড়ি চলে যান।

জন্ম, স্থান, দিনক্ষণ, লালন পালন।

কম বেশি পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৪ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর , বাংলা ১৩০১ সালের ২৮ ভাদ্র, নদীয়া জেলার মুরাতিপুর গ্রামে মামারবাড়িতে, বিভূতিভূষণের জন্ম হয়, । জন্মস্থানটি এখন কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। আত্মীয় পরিজনদের কাছে পাওয়া জনশ্রুতি অনুযায়ী, বিভূতিভূষণের জন্মের পরে হেমাঙ্গিনী আর কখনো বারাকপুরে আসেন নি।বিভূতিভূষণের জন্মের পরে হেমাঙ্গিনী শেষবারের মতো বনগ্রাম মহকুমায় বারাকপুরে শ্বশুরবাড়ি এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে কাশী চলে যান।এই বড়োমা কে বিভূতিভূষণ যে চিরকাল খুবই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালো বাসতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর দিনলিপিতে এবং ভ্রাতৃবধু যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক লেখায়।

তাঁর পরে মহানন্দের আরো চার সন্তানের জন্ম হয়েছিলো। ১৩০৪ বাংলা সনের ১৮ ভাদ্র ভাই ইন্দুভূষণ, ১৩০৫ সনের ৬ চৈত্র জন্মান প্রথম বোন জাহ্নবী,১৩০৮এর ১১ আশ্বিন জন্মান পরের বোন সরস্বতী এবং ১৩১২র ৮ শ্রাবণ জন্মান সব চেয়ে ছোটো ভাই নুট্ বিহারি । (অনেকে এই নামটিকে নুটুবিহারি বলে ভূল করেন)।

মহানন্দের সংসারে অসাচ্ছল্যই ছিল নিত্য। কিন্তু এই অপ্রতুলতার মধ্যেও বড়ো ছেলের অন্নপ্রাশনে বেশ জাঁকজমক করেছিলেন তিনি। সুন্দর সুন্দর গয়না, কোমরে সোনার গোট, মাথায় মুকুট পরিয়ে পাড়ায় 'চলন' ঘোরানো হয়েছিল।

বাবার কাছেই হাতেখড়ি ও শিক্ষার শুরু। তখন বছর পাঁচেক বয়স তাঁর।রোজ সকালে একটি করে নতুন বর্ণপরিচয় লাগত খোকার। প্রতিদিন সকালে পড়তে ডাক পেলেই সে জানাত 'বই ছিঁড়ে ফেলেছি বাবা'। মহানন্দ নতুন বই দিতেন তখন। অথচ পড়তে লিখতে শিখতেন খুব দ্রুত।মেধাবী ছিলেন, পড়তে ভালোবাসতেন ছোটোবেলা থেকেই। প্রায় তখনই সংস্কৃতের পাঠও দিতে শুরু করেছিলেন মহানন্দ। যখন পড়তে শেখা হয়নি তখনো তাঁর বাবার মতোএকটি বইখাতার দপ্তর ছিলো খোকার। বাবার পাশে বসে বা অন্য অবসরেও তাকে সেসব নিয়ে মনোযোগ দিয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। বাবাকে খুব আঁকড়ে থাকতেন, সহজে কোথাও যেতে দিতে, ছাড়তে চাইতেন না। 'তবু যেতে দিতে হয়' । হোতোই।এই নিত্য আসা যাওয়ার পাঠটি বিভূতিভূষণের জীবনদেবতা তাঁকে খুব শিশুকাল থেকেই আত্মস্থ করিয়েছিলেন।

বাল্যকাল

বাল্যকালের স্বভাবটি তাঁর খুব নরম-সরম। চারপাশের রূঢ় কর্কশ সমাজে পরিচিত পরিজনদের কাছ থেকে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, বা তাঁদেরর খানিক মনোরঞ্জন করে খুশি করার চেষ্টা বিভূতিভূষণের স্বভাবে আশৈশব দেখতে পাওয়া যায়। কথকতার নকল, গয়না প'রে ছড়া বলা, নাচ গান করা, এবং কখনো শৈশবেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার খবর পাওযা যায় তাঁর বিষয়ে লেখায়। এসবের মধ্যেই বিভূতিভূষণের মধ্যে তাঁর 'সুদূরের পিয়াসী' অন্বেষী সত্বাটি ক্রমে বিকশিত হয়েওঠে।

এই ভাবে একটু বড়ো হয়ে উঠলে শৈশবেই বাবার সঙ্গে দূরভ্রমণে বেরোনো শুরু হয়। নিশ্চয়ই মৃণালিণীকে কিছুটা সহায়তা দিতেই বড়ো খোকাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন মহানন্দ।এক ছেলের চাপ স্ত্রীর ওপর থেকে খানিক কমত । ফলে বাবার কাছেই বাল্য পাঠশালা রইল কিছুদিন।

জীবিকার অন্বেষণে মহানন্দএই সময় বারাকপুর ছেড়ে শাগঞ্জ কেওটায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। আশা ছিলো নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়ার রাজবাড়িতে প্রায় নিত্য ভাগবতপাঠের বা কথকতার সভায় এবং কাছাকাছি হুগলী চন্দননগরের ধর্মপ্রবণ পরিবেশে তাঁর কথকতা জমে উঠবে। মন্দ হয় নি সেটা। সেখানেই প্রসন্ন মোদকের মুদিখানা-তথা-পাঠশালায় বিভূতির প্রথম বাইরের পাঠ শুরু হয়। এই পাঠশালার কথা পথের পাঁচালীতে বলেছেন বিভূতি, তবে পরে পরে অন্যান্য পাঠশালার অভিজ্ঞতা ওনিশ্চয়ই তারমধ্যেমিশে গিয়েছিলো।কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মহানন্দের দ্বিতীয় পুত্র ইন্দুভূষণ সেসময়ের অনারোগ্য কোনো অসুখে মারা যান। শোনা যায় হুপিং কাশি । অবশ্য পুত্রতারাদাস তাঁর 'বিভূতিভূষণের সংসার' বইয়ে এ মৃত্যুর কারণ টাইফয়েড লিখেছেন । তখন মহানন্দ সেখানকার বাস উঠিয়েকিছুকাল শ্বশুরবাড়ি মুরাতিপুরে কাটিয়ে আবার বনগাঁ বারাকপুরে ফিরে আসেন। এই সময় দিয়ে মহানন্দর সঙ্গে বিভূতির জীবনেও বেশ অস্থিরতা চলেছে।এখানে হরি রায়ের পাঠশালায় বিভূতির দ্বিতীয়বার পাঠশালায় পড়তে যাওয়া শুরু হয়। মুরাতিপুরে বিপিন মাস্টারের পাঠশালা এবং কিছুকাল, বাবার সঙ্গে কলকাতায় থাকতে বাগবাজার আপার প্রামারি পাঠশালাতে ও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। এই পর্যায়ের শেষে তিনি যে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তাকে তুঁততলার ইস্কুল ও বলা হোত। সব তথ্য জুড়লে মনে হয় হরি রায়ের পাঠশালার পাট ও তাড়াতাড়ি শেষ হয় গেলে তিনি চলে যান তুঁততলার ইস্কুল।

<u>দারিদ্র্য লেখা পড়া , উচ্চবিদ্যালয় প্রবেশ কৃতিত্বে জলপানি, বন্ধুদের সঙ্গে জলে জঙ্গলে গুপ্ত অভিযান, কুঠির মাঠ</u>

এখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেও, দারিদ্র্যের জন্য এবং দেশে বাবার অনিশ্চিত উপস্থিতির জন্য বিভূতির বিদ্যালয়ে লেখাপড়া কিছুকাল স্থগিত হয়ে যায়।তবে মহানন্দর সংগ্রহে নানারকম বই থাকায় তাঁর জ্ঞানার্জন ঠিক থেমে ছিল না। কিন্তু তাঁর পড়তে যাওয়ার দুর্নিবার অদম্য টান এবং মা মৃণালিনীর স্নেহময় সমর্থন বিভূতিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল। দরিদ্র মা তাঁর শেষ অবশিষ্ট সম্বল নিজের,রুপোর কোমরের গোটটি বাঁধা দিয়ে সাতটাকা পেয়ে এনে ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মহানন্দ তখন দূরে কোথাও যজমনী ও কথকতায় জীবিকা অর্জনে ঘুরে বেড়াচছেন।

একা একাই বিভূতি সাত মাইল রাস্তা পেরিয়ে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে পপৌঁছন। কিন্তু স্বভাবে লাজুক গ্রামের ছেলে জানেন না কি করে ভরতি হতে হবে, কাকেই বা বলবেন। পরপর তিনদিন তিনি এ ভাবে গিয়ে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ সে সময়ের প্রধান শিক্ষক মশায়, শ্রী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চোখে পড়েন। চারুচন্দ্র সস্নেহো এই দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে নিলেন এবং মাস দুই পরেই প্রথম হয়ে পরের ক্লাসে ওঠায় তাঁর পড়ার খরচ মকুব করে দেন হেডমাস্টার মশায়।

কৈশোরে পিতৃবিয়োগ

এর পরে বাধা বিপত্তি ও দারিদ্র্য অনাহারের মধ্যে দিয়ে হলেও বিভূতিভূষণের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ আর থেমে থাকে নি। বিভূতির অষ্টম শ্রেনীতে পড়ার সময়ে মহানন্দ মারা যান। সে সময়ে দিয়ে বিভূতি কিছু টিউশনিও করতেন। জানা যায়, শেষ শয্যায় বাবার ইচ্ছে হয়েছিল আঙুর খাবার। নিজের উপার্জিত টাকায় আঙুর কিনেও জীবিত পিতার কাছে পৌঁছতে পারেন নি বিভূতি। এবং সেই অবধি জীবনে আর কখনো আঙুর খান নি তিনি। মেট্রিক পরীক্ষার এতটা আগে পিতৃবিয়োগে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিলো তখন।

খুবই পড়তে ভালোবাসতেন বিভূতি। বাবার প্রবাস থেকে ফেরা সব সময়েই বিভূতির নতুন বই লাভ করার আনন্দে ভরে যেত। সেই ছোটোবেলা থেকেই পড়তে ও প্রকৃতি দেখতে টান, এবং আবেশি ভাবুক মনের লক্ষ্মণ, ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনে। পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ স্কুলে যাতায়াতের সময় অচেনা মানুষদের সঙ্গে এমন কি যারা বয়স্ক তেমন নিম্ন বর্গীয় মানুষদের সঙ্গেও সহজ সবিনয় বন্ধুত্বে জড়িয়ে যেতেন তিনি। 'তুমি ক'নে যাবা, ও কাকা?' এই ধরণের উপক্রমণিকা দিয়ে শুরু করে, চলতে চলতে, অপরিচিত কোনো আদালত ফেরতা বয়স্ক কৃষকের অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে যেতেন সহজেই। আবার যথেষ্ট সাহসী এবং খানিকটা ডানপিটেও ছিলেন, অবকাশ পেলে স্কুল থেকে সহপাঠি ক'জন বন্ধুর সঙ্গে অজানা বনে বাদাড়ে, সংলগ্ন এলাকার পোড়ো বাড়ি, মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদির লুপ্তপ্রায় ধংষাবশেষ দেখে বেড়াতেন, কুঠির মাঠে বা ছোটো নৌকোয় ইছামতীর জলে ভেসে পড়তেন ছেলেমানুষী দস্যিপনার আনন্দ করতে। আবার এই সময থেকেই তাঁর ভূগোল বইয়ে তারা ও মহাকাশ ভালোলাগা শুরু হয়ে যায়। এসব কথা জানা যায় তাঁর বিষয়ে, শ্যালক শ্রী চন্ডীদাস চট্টোপাধয়ায়ের বই ও অন্য দুটি লেখা থেকে লেখা থেকে।

জলপানি পেতেন তবু রক্ষা , পরীক্ষায় ভালো ফল করতেন বলে । বাবার মঁত্যুর পরে খুবই দুঃখ কষ্ট বঞ্চনার অপমাণের মধ্যেদিয়ে লেখাপড়া করে, ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ফার্স্ট ডিভিশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপানি ও পান। তার পর কলকাতার রিপন কলেজ (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯১৬ সালে ফার্স্ট ডিভিশনেই আইএ এবং ১৯১৮ সালে ওই কলেজ থেকেই ডিস্টিংশনে বিএ পাশ করেন। মেসে থাকা আইএ, বিএ পড়তে অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে অর্ধাহারে, অনাহারে, পাওনাদারের অপমানে ও মায়ের জন্য অর্থসংস্থান না করতে পারার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেয়েছেন।কিন্তু আশ্চর্য, ওই ঘোর অভাবের মধ্যেও তাঁর প্রিয় জায়গা ছিলো কলেজের লাইব্রেরি। ওয়াইড ওয়ার্ল্ড পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর এঙানেই পরিচয়, যে পত্রিকা পরবর্তীকালে তিনি নিয়মিত কিনে পড়তেন। বিশ্বের সেরা সাহিত্য ছাড়া, কলেজজীবন থেকেই তাঁর অন্য প্রিয় বিষয় ছিলো বিভিন্ন দেশের ইতিহাস। অভাবে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারে নি তাঁর জ্ঞানপিপাসী স্বভাবকে। ইনিই তো 'অপরাজিত' লেখবার যথার্থ অধিকারী ।

শ্রী চন্ডীদাস চট্টোপাধয়ায়ের লেখা থেকে এও জানা গেছে,একবার, মেসের ভাড়া, ও খাবার বাকি থাকা খরচ না দিতে পারার জন্য,মেসে থাকতে পারেননি, সারাদিন কিছু খাওয়া জোটেনি, অনেক রাতে শুধু জল খেয়ে, ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলের বাইরের চিলতে শানবাঁধানো জায়গাটায় শুয়েছিলেন। তখন ইংরেজের কর্তব্যপরাযণ পুলিশ কন্স্টেবল

এসে গালিগালাজ করে তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। বিএ পরীক্ষার ফি দিতে পারেননি, ভেবেছিলেন পরীক্ষা দিয়ে বিএ পাশ করা আর হোলো না। কিন্তু তাঁর অজান্তেই কেউ তারঁ ফি দিয়ে দিয়েছিলেন বলে পরীক্ষায় বসতে পেরেছিলেন বিভূতি। পরে অনুমান করা যায়, তাঁকে যিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন, আচার্য প্রতুল্লচন্দ্রই ওই ফি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর এভাবে গড়ে তুলছিলেন তাঁর প্রিয় বিশ্বপথিক সন্তানটিকে। মানসনির্মাণের পথটি তাঁর ব্যথার কাঁটায় ভরে ছিলো। এ যেন রবিঠাকুরের সেই গানটির এক বাস্তব নিদর্শন, 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা।

এর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ এবং ল তে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষত মায়ের কষ্ট লাঘব করা ও অন্যান্য ভাইবোনদের ঠিকমতো বড়ো করে তোলার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার জন্য এবং অন্য নানা কারণে লেখাপড়া চালানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

<u>বিবাহ, কর্মজীবন,ও পরবর্তী সংসার কথা</u>

বিয়ের বাজারে বিভূতি,প্রবেশিকার পরে কলকাতায় পড়তে আরম্ভ করার সময় থেকেই খুব মূল্যবান পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বাড়িতে ঘটকের আনাগেনা, ভালো 'পাল্টি' ঘর থেকে প্রস্তাব আসা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বিএ প্রথম বর্ষে পড়ার সময় মৃণালিণী, বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেন। বিভূতির বিদ্যোৎসাহী শ্বশুরমশায় তাঁর জামাতার কলকাতায় লেখাপড়া চালানোর ব্যায় বহন করতে চান। কিন্তু মাত্র একবছর পরেই কলেরা রোগে গৌরীদেবীর অকালমৃত্যু ঘটে। ১৯১৮ সালের ২১ নভেম্বর। বিভূতির অন্যতমা জীবনীকার, তাঁর ভ্রাতৃবধূ যনুনা বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপল ব্যথিত গতি' বইটিতে লিখেছেন, 'গৌরীদি তখন বাপের বাড়িতে আছেন। সংবাদ এলো তিনি অসুস্থ। বড়ঠাকুর দেখতে গেলেন। পথে যেতে যেতে এক মুদী দোকানীর কাছে শুনলেন গৌরী মারা গেছে এবং তার শেষ কাজও সমাধা হয়ে গেছে।...ওদের বাড়িতে কলেরা দেখা দেয়, পাঁচজনের কলেরা হয়। গৌরীদির মা ও গৌরীদি দু'জনে কলেরাতেই মারা যান। অতর্কিত আঘাতের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।শ্বশুরবাড়ি না ঢুকেই তিনি উদভ্রান্তের মতো বাড়ি ফিরে এলেন। মা উৎকন্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, বাড়ি আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, গৌরী কেমন আছে?" ..একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন, গৌরী মারা গেছে মা।"'

বিপর্যস্ত অবস্থায় তখন থেকে বহুদিন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়েছেন বিভূতিভূষণ, কিন্তু কর্তব্যে কোনো ত্রুটি হয় নি কখনো। মায়ের ঘরে দারিদ্য মোচন করে ভাই বোন দের সম্ভবমতো যথাযথ প্রতিপালন করে তাদের বিয়ে দিযেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত হতে সর্বতোভাবে সহায়ক হয়েছিলেন।

পড়াশোনা ঠিকমতো শেষ হোল না, তিনি হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ায় মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করতে গেলেন। বোনেদের বিবাহ দিলেন। ভাইয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন। ছোটো বোন সরস্বতী বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান । বড়োবোন জাহ্নবী এর কিছুদিন পরে দুটি পুত্রকন্যা, শান্ত এবং উমাকে নিয়ে বিধবা হলে, সেই পরিবারের প্রতিপালনের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন বিভূতি। ছোটোখাটো অপমানের জ্বালা তখনো তাঁকে ছেড়ে যায় নি। পুরোনো পূর্বপুরুষের ভিটে ভেঙেচুরে গিয়ে বাসযোগ্যতা হারালে,তাকে সারিয়ে তোলার অর্থসংস্থান ছিলো না তাঁর।।কিছু

কাল বাদে জাঙ্গিপাড়া ছেড়ে হরিনাভি গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সেখানে মাকে এবং বনগ্রামের স্কুল ও বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে ভাই নুট্ব বিহারী নিয়ে এসে রেখেছিলেন কাছে । পরে ভাইকে ডাক্তারি পড়ান কলকাতায় রেখেই। বনগাঁ বারাকপুরে তাঁরই একসময়ের শিক্ষক হরি রায় মশায়ের স্ত্রী , যাঁর নামও ছিলো হেমাঙ্গিনী, যাঁর সঙ্গে মা মৃণালিণীর সই পাতানো ছিলো বলে সইমা বলে ডাকতেন, তাঁর দুঘরের খড়ের চালের একটি বাড়ি কিনেছিলেন বিভূতি। সেই বাড়িটিকেই এখন বিভূতিভূষণের বাড়ি হিসেবে বেশিরভাগ মানুষ জানেন ।

এই সময় থেকেই যেন এক পরিব্রাজকের জীবনে উত্তীর্ণ হলেন বিভূতিভূষণ। হরিনাভি তে থাকার সময়েই কথাসাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন । শুরু হোলো তাঁর কথাশিল্পীর জীবন। এখানেই তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' লেখা হয় এবং, ১৩২৮ সালের (ইংরেজী ১৯২২) মাঘ মাসের প্রবাসীতে সে গল্প প্রকাশিত হয়। মা কে সইমার বাড়ি কিনে স্থিত করে দেবেন ভেবে হরিনাভির বিদ্যালয় ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সেখানে ফেরার আগেই হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় মৃণালিনী মারা গেলেন, ছেলের কেনা বাড়িতে এসে থাকা তাঁর হয়নি।

চাকরী খুঁজতে খুঁজতে পেলেন 'গোরক্ষণী সভা'র প্রচারকের কাজ। সেই সুবাদে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, ও আরাকানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কখনো নৌকায়, কখনো ট্রেনে, জাহাজে আর পদব্রজে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ পেয়ে গেলেন। এই সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে ডাকহরকরার সঙ্গে প্রায় তিরিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে আরাকান-ইয়োমা পাহাড়েরএকটি ডাকঘর পর্যন্ত গিয়ে মাঝপথে একটা দরমাবাঁশের বেড়ায় তৈরি ঘরে রাত কাটিয়েছিলেন । ঘোর ঠান্ডার মধ্যে শুধু খানিকটা ভাত খেয়ে, নুনও ছিলো না সঙ্গে। পরের দিন ডাকহরকরা বদল হল বিভূতি কিন্তু ফিরলেন না বদলি হরকরার সঙ্গে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। এক দুঃসাহসী পরিব্রাজক ছিলো তাঁর অন্তর্দেশে যার পরিচয় বারবার পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে কিছুকাল তিনি কর্মহীন হয়ে ৪১ নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রীটের এক মেস বাড়িতে ছিলেন বিভূতি, তখনই পাশের ঘরের নীরদচন্দ্র চৌধুরির সম্ঘে বন্ধুত্ব হয়। ইতিমধ্যে 'উপেক্ষিতা' দিয়ে শুরু করে 'উমারানী', 'মৌরীফুল' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প প্রবাসী, ও অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে।এসময় পাথুরিয়াঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এর বাড়িতে গৃহশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেটা ১৯২৯ সাল । কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে শ্রী ঘোষ নিজেদের ভাগলপুর এস্টোটের ম্যানেজার করে তার বিলি বন্দোবস্তর কাজে সেখানে পাঠান। যেখানেই লবটুলিয়া বইহার, নাটা বইহার, মহালিখারূপ পাহাড় সন্নিধ বিস্তীর্ণ অরণ্য ও দিয়ারা জাতীয় জলাজঙ্গলের ইজারা পত্তনি দেওয়ার তত্ত্বাধানের কাজে প্রায় দেড়-দু বছর সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। ভাগলপুরে তাঁর থাকবার বাড়িটির নাম ছিলো বড়ো বাসা। এই বাড়িতেই সন্ধে বেলায় লন্ঠনের আলোয় বসে লেখেন পথের পাঁচালী তাঁর প্রথম উপন্যাস, তখনকার যথেষ্ট বিখ্যাত সাময়িক পত্র 'বিচিত্রা'-য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলো বইটি। তাঁর এসময়ের আরণ্যপ্রবাসের সমস্ত হৃদয়স্পর্শি অভিজ্ঞতার ই কাহিনি তাঁর অন্য আর এক কালোত্তীর্ণ উপন্যাস 'আরণ্যক'।

আশৈশব প্রকৃতিনিমগ্ন এই অসামান্য মহানন্দ সন্তানটি তাঁর এই অরণ্যপ্রবাসের কাল থেকেই ক্রমশ গভীর ভাবে অরণ্যপ্রেমীও হয়ে উঠলেন। ১৯৩০ খৃষ্ঠাব্দের পর থেকেই তিনি তৎকালীন বিহারের ঘাটশিলা ও গালুডি অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝেই সেখানকার জঙ্গলআধিকারিক ও অন্য বন্ধুলাভ হওয়ায় সেসব জায়গায় সাহিত্যবাসর ও যাতায়াত বাড়ে এবং এরমধ্যেই সৌভাগ্যবশত একটি বাড়ি ও ঘাটশিলায় কেনা হয়ে যায় তারঁ। প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিকে গভীর মমতায় মনে রেখে সে বাড়ির নাম তিনি রাখলেন 'গৌরীকুঞ্জ' । অবসর পেলেই সেখানে সময় কাটাতে চলে যেতেন তিনি।

সংসারে কর্তব্যপরায়ণতায় অসামান্য ছিলেন বিভূতিভূষণ। নিয়মিত চাকরির সময়ে, যতই ভবঘুরে থাকুন, মা, ও ভাইবোনদের সংসারযাত্রায় নিজের কর্তব্যে ত্রুটি হয় নি কখনো। যে অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুঝতে যুঝতে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে বড়ো ছেলেকে লেখাপড়া করিয়েছিলেন মৃণালিনী, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সংসারের কোনো কর্তব্যের অমর্যাদা করেন নি মৃণালিনীর বড়োছেলে। নিজের বড়োবোন জাহ্নবী, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন এক পুত্র ওএক কন্যা নিয়ে। সে সংসার প্রতিপালনের দয়িত্বও অকাতরে অসীম মমতায় বহন করেছেন এই প্রেমময় সাহিত্যসাধক।

<u>দ্বিতীয় বিবাহ ও সংসারযাত্রা থেকে মহাপ্রয়াণ</u>

বহুদিন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার পর ১৯৪০ সালে ৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন বিভূতিভূষণ,ফরিদপুরের ছয়গাঁও গ্রামের ষেড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রমা দেবীকে। রমা নিজেও লিখতেন, ততদিনে তাঁর লেখা গল্প 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, ১৯৩৯ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি এক টেলিগ্রাম পেয়ে বারাকপুর গ্রামে এসে বিভূতি দেখেন বোন জাহ্নবী ইছামতীতে ডুবে মারা গেছেন। ভাগনা ও ভাগনি, শান্ত এবং উমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেনও খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে যান। এ সময়টাতে সরকারী কালেকটরেটের আবগারী অধিকারিক হিসেবে ষোড়শীকান্ত বনগাঁয় বাস করছিলেন। একদিন এসব কিছু না জেনেই পথের পাঁচালীর লেখককে কয়েকজন মিলে দেখতে আসেন রমা এবং ওরকম শোক ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁদের দেখে নিজেদের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানান । এই পরিচয় থেকেই ষোড়শিকান্ত, রমার ইচ্ছায় বিভূতিকে নিজের দ্বিতীয় কন্যাটিকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রাধানত বয়সের বেশি ব্যবধানের কারণে প্রথমে ঘোর আপত্তি জানান বিভূতিভূষণ। রমাকে আলাদা করে ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ এক্ষেত্রে রমার অনড় প্রতিজ্ঞার ভিতর দিয়ে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়া স্ত্রী রমা দেবীকে নিয়ে বনগাঁ-ব্যারাকপুরে স্থায়ী সংসার পাতেন ১৯৪২ সালে। এসময় থেকেই প্রত্যেক বছর ছুটি পেলেই কয়েকমাস ঘাটশিলায় গিয়ে কাটিয়ে আসতেন তাঁরা। তাঁর ভাই নুট্ বিহারী সেখানেই ডাক্তারি করতেন ও স্ত্রী যমুনাকে নিয়ে সংসার করতেন। বিভূতিভূষণ পুজোর শুরুতে সেখানে সস্ত্রীক যেতেন আর ফিরতেন শীতের গোড়ায়। তাঁর উপস্থিথির জন্যই সেখানে সাহিত্যসমাগম ঘটত, খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা কলকাতা বা অন্যত্র থেকে সেখানে যেতেন। এঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর, বনফুল, গজেন্দ্র মিত্র সুমথনাথ ঘোষ এবং অনুজপ্রতিম সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ ও

অচিন্ত্যকুমার ছিলেন। এই শচীন্দ্র নাথের সঙ্গে পরে ভাগ্নী ঊমার বিবাহ দিয়েছিলেন। অবশ্যই গোপালনগরে হরিপদ ইন্স্টিটিউশন স্কুল খুলে গেলে, সপ্তাহে দুসপ্তাহে একা এসে সে কর্তব্যও সম্পাদন করে যেতেন ছাত্রবৎসল এই মাস্টারমশায়। শিশু কিশোরদের জন্যও, লিখেছেন অপূর্ব সুন্দর সব কাহিনি। 'মিসমিদের কবচ', 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডংকা বাজে', 'হীরা মাণিক জ্বলে' উপন্যাস গুলি যার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর রচনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা শেষে সংযোজিত করা হোল।

দেশভ্রমণের খুব টান ছিল। এসময় বিহার সরকারের বনবিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের আতিথ্যে তিনি সিংভূম, হাজারীবাগ রাঁচি ও মানভূম জেলার বহু আরণ্য পার্বত্য অঞ্চলে খুব রোমাঞ্চকর স্থানে অনেকসময় সস্ত্রীক ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। যে সময়ের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় তাঁর, 'বনে পাঃহাড়ে' এবং 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থগুলিতে। এসময়েই তাঁর অনেক কালজয়ী কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর ঘাটশিলায় নিজের বাড়িতে রাত্রি আটটা পনেরো মিনিটে বিভূতিভূষণ পরলোক গমন করেন। বিভূতি-রমার সুযোগ্যপুত্র তারাদাস, অতি শৈশবে পিতৃহারা হয়েও অপরাজিত অপুর ঐতিহ্য বহন করে সার্থক সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন।

<u>রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ</u>

১৯৫০ সালেই প্রকাশিত জীবনের শেষ সমপন করা উপন্যাস 'ইছামতী' তাঁর প্রয়ানের পরে সে বছরই রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি মুগ্ধ ভক্তি বিভূতিভূষণের প্রায় আবাল্য এক মহাজাগতিক পথনির্দেশের মতো সঙ্গে ছিলো। তিনি নিজেই লিখেছিলেন ''রবিঠাকুর। ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। তুঁততলার আপার প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়ে, তাঁর আট ন বছর বয়স, হেডমাস্টার মশায় গগনচন্দ্র পাল একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। বিভূতিভূষনের লেখা থেকে পাই, ' তখন আমাদের হেডমাস্টার মশাই গগনচন্দ্রপাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতে মন্ত্রমুগ্ধের মত গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি,কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরামদাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনো শুনিনি। যেন একটি অপূর্ব সঙ্গীত – অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত – অশ্রুতপূর্ব বাণী।হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ' - লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। এবং নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্যমিশে গিয়ে ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়া লোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মায়ালোকের মানুষ।'

১৯১৩ সালে কবির নোবেল পুরস্কার পাবার সময়ে বিভূতি বনগ্রাম হাইস্কুলে তখনকার ফার্স্ট ক্লাসের, মানে দশম শ্রেনীর ছাত্র, খবরটি শুনে তাঁর মনে হয়েছিল 'আমাদেরই একজন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারেউচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবরা দেখুন আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলাদেশের তথা সারা বারতবর্ষের সম্মান – আমাদের

সম্মান।' একই লেখায় তিনি জানিয়েছিলেন 'তাঁর কবিখ্যাতির কথা যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা তত প্রসার লাভ করে নি সে সময়ে।'

কবিকে প্রথমবার দেখার অভিজ্ঞতাও একই লেখায় লিখেছেন বিভূতিভূষণ 'একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে,আজ সেন্ট্ পল্স্ কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে রবিবহাবু আসবেন - দেখতে যাবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন সেন্ট পল্স্ কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে - ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়ে নি - তিনটে হবে। ..... রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যেকার সরু রাস্তা দিয়ে। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তি। ... একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য-লাভের আনন্দে আমি তখন আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা বটে আজ।...বক্তৃতা দিতে উঠলেন ...এমন কন্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি, মনে হল এ কন্ঠস্বর অসাধারণ ... যা হাজার লোকের মধ্যেও আলাদা করে চিনে নেওযা চলবে ... বক্তৃতার আর কোন কথা আমার মনে নেই ... কেবল মনে আছে ... অনবদ্য ভঙ্গীতে ডান হাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেচেন, সবাই জানেন তাঁর আঙ্গুল দেখলে চাঁপার কলির কথা মনে হত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বললেন, "কল্পলোক,... কল্পলোক" - কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে, আরো অনেক কিছু বলেছিলেন মনে নেই।' (প্রথম দর্শন, বিভূতি রচনাবলী, শতবার্ষীকি সংস্করণ, ৬, ৬৫৬-৬৫৭)।

১৯৩১ সালে ১৮ নভেম্বর বিভূতিভূষণ ৪১মির্জাপুর স্ট্রীট লজ টি থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন যাতে ছিল,'আপনাকে কোনোদিন পত্র লিখি নি এজন্য পত্র লিখতে ভয় করে। ... গত শ্রাবণ মাসে একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সে সময় আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে কিছু লিখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু আপনার শরীর ভালো ছিল না বলে তারপর এ নিয়ে কোনো কথা ওঠাই নি।' এ চিঠি চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, ১৩৭১ সালে শারদীয় 'আলেখ্য'-য় প্রকাশিত হয়। এই চিঠির সঙ্গে একটি পথের পাঁচালী ও একটি 'মেঘমল্লার' পাঠিয়ে, আরো লিখেছিলেন,'আপনার সময়মত যদি কিছু লেখেন, তবে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করব। এর উত্তর পেতে অনেকটা সময়ই চলে গিয়েছিলো। ১৯৩৩ সালে ৫ই এপ্রিল বিভুতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের ডাক পেযেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে দেখা করতে যাবার।রবীন্দ্রনাথ সেদিন জানিয়েছিলেন, পথের পাঁচালী নিয়ে তিনি লিখেছেন 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪০ আষাঢ় সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বইখানা দঁড়িয়ে আছে আপেন সত্যের জোরে।' লেখাটি সম্প্রতি শ্রী আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত দিবারাত্রির কাব্য, বিভূতিভূষণ সংখয়ায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের ও খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন বিভূতিভূষণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠের আসরে নিয়মিত ডাক পেতেন। কবিগুরু বলে পাসঠাতেন, 'বিভূতিকে কিন্তু আনা চাই'। দুজনেই পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কে জানে সে জগতে দুজনের দেখা হযেছে হয়তো, নিজের লেখা 'দেবযান' নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করেছেন কথাশিল্পী। কবির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁর আশৈশব , প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকেই আত্মগত ছিলো বিভূতির।

রমা চট্টোপাধ্যায় যেদিন প্রথম ব্যারাকপুরের বাড়িতে বিভূতিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সেদিন সঙ্গে তাঁর দিদি মায়ার দেওয়া একটি অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। লেখকের সামনে দিদির অনুরোধটি অনেক কুন্ঠার সঙ্গে মেলে ধরলেন রমা। বিভূতি লিখে দিলেন 'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু'। পিতামহ তারিণীচরণ ও পিতা মহানন্দের গতিশীল জীবনের উত্তরাধিকার নিজের জীবনের যাপনে অর্জন করে পরবর্তী প্রজন্মকে তা বহন করার আশীর্বাদ রেখে গেলেন এই ঋষিপ্রতিম সাহিত্যসাধক তাঁর অজস্র বিখ্যাত ছোটো গল্প ও কালজয়ী উপন্যসের মধ্যে।

তথ্য সূত্র:
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – দিনের পরে দিন
প্রথম দর্শন, বিভূতি রচনাবলী, শতবার্ষীকি সংস্করণ, ৬, ৬৫৬-৬৫৭।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতিভূষণের সংসার
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - পিতা নো অসি (উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিকরচনা)
রমা বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে থেকে দেখা
যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় উপল ব্যথিত গতি
যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনান্তবেলায়
চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী

রুশতী সেন বিভূতিভূষণ (বাংলা অকাদেমি, কলকাতা,১৯৯৫)

তপোব্রত ভাদুড়ি "কথাসাহিত্যের আলোকে বিভূতিভূষণের প্রেম মনস্তত্ব" (অপ্রকাশিত পি ইচডি সন্দর্ভ) এবং
পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত মহানন্দ ও বিভূতিভূষণের বিভিন্ন চিঠিপত্র, শারদীয় আলেখ্য, ১৩৪০ ও আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত দিবা রাত্রির কাব্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪।
লেখার তালিকাটির প্রধান তথ্যসূত্র : রুশতী সেন , বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাআকাদেমি,১৯৯৫।